**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.173 - 178)
**Published in July, 2025**

# সাহিত্য, সমাজ ও প্রতিবেশের ওপর মানবেতর প্রাণীর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

ড. মীজানুর রহমান মিজু*

**প্রতিপাদ্যসার:** পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা, মাটি,আলো, বাতাস-পানি-সবকিছু নিয়েই গড়ে উঠে পরিবেশ। মানুষ এই পরিবেশেরই অঙ্গ; এই পরিবেশেই সে জন্মলাভ করে এবং লালিত-পালিত হয়। অর্থ্যাৎ মানুষ পরিবেশ-বহির্ভূত কোন সত্তা নয়। পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানের সাথে সম্পর্ক রেখে এবং খাপ খাইয়ে চলতে হয় তাকে। পরিবেশের অন্যতম উপাদান মানবেতর প্রাণিকূলও সেই সূত্রে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্থিক, জৈবিক, পরিবেশগত ও অন্যান্য কারণে পশুপাখি ও জীবজন্তুর ওপর মানুষের নির্ভরতা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। পশুপালন সভ্যতার বিকাশ ও মানুষের কৃষি-নির্ভরতা মানুষ ও পশুপাখির সম্পর্ককে আরো নিবিড় করেছে। ফলে মানুষের সামাজিক জীবন-প্রবাহে মানবেতর প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ সংশ্রব রয়েছে। আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও প্রতিবেশে মানবেতর প্রাণির এই সংশ্লিষ্টতার স্বরূপ অনুসন্ধান করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রাচীনকাল থেকে তথা মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর সম্পর্ক নিবিড় ও অবিযোজ্য। 'মানব'-এর সাথে 'ইতর' যোগ করলে (মানব+ইতর) হয় 'মানবেতর'। 'ইতর' অর্থ ভিন্ন, ব্যতীত, এছাড়া, অন্যকিছু। তাই 'মানবেতর প্রাণীর অর্থ হলো মানব ভিন্ন অন্যান্য প্রাণী। 'ইতর' বলতে অবশ্য অভদ্র বা অশিষ্টও বোঝায়। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর ভব্যতা-সভ্যতা বা ইতরামো নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। মিতালী ঘোষের মতে, আমরা জানি, মানুষ ছাড়াও এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এসব প্রাণীর চেতনা থাকলেও বোধশক্তি বা ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা বেশির ভাগেরই নেই। এদের আমরা 'মানবেতর' প্রাণী বলে থাকি। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এসমস্ত প্রাণীকে ব্যবহার করে বা তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আচরণ করে থাকে যা আসলেই কাম্য নয়। কারণ প্রাণীদেরও অধিকার আছে, মূল্য আছে যেভাবে অন্য সত্তার অধিকার এবং মূল্য আছে। (**মিতালী ১৩৬**)। সৃষ্টির আদি লগ্নে মানুষ কেবল পশু শিকার করে তার আহার সংগ্রহ করতো। ফলে বলা যায়, তখন মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ছিল মূলত: খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক। এছাড়া পশুর চামড়া ছিল তাদের পরিধেয়। ক্রমে কৃষি-সভ্যতার পত্তন ঘটলে পশুর গুরুত্ব শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, খাদ্যোৎপাদনের সহায়ক শক্তি হিসেবেও ব্যাপকতা লাভ করে। পশুপালন সভ্যতার বিকাশ ঘটলে মানুষ তার নানাবিধ প্রয়োজন মিটাবার উপায় হিসেবে পশুপাখি প্রতিপালন শুরু করে। এসব প্রাণী এক দিকে মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়; অন্যদিকে নানাভাবে মানুষকে সহায়তা করে তাদের কষ্টসাধ্য জীবনকে অনেকটাই সহজ করে তোলে। এভাবেই মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার তারতম্যের কারণে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যকার সম্পর্কের ধরনেও বিবর্তন আসে। আদিকালের বুদ্ধিহীন ও অজ্ঞ মানুষ বড় বড় পশু দেখে ভয় পেতো; কারণ তাদের আত্মরক্ষার কৌশল তখন জানা ছিল না। আগুন জ্বালাতে পারা মানুষের সর্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।.....এই মহান আবিষ্কারের ফলে পশুদের ওপর তার একটু আধিপত্য হলো--পৃথিবী জয়ের প্রথম সন্ধান সে পেল (**নেহেরু ২৯**)। ক্রমে মানুষ বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতায় শাণিত হয়ে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী ও বিরাটকায় এমনকি হিংস্র জন্তুকেও বশীভূত করতে সক্ষম হলো। মানুষ এসব প্রাণীকে তার ইচ্ছে মতো কাজে লাগানোর মতো বুদ্ধিদীপ্ত ও কৌশলী হয়ে উঠলো। ফলে, মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যকার সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে এলো। আজকের সভ্য মানুষ মানবেতর প্রাণীকে পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে মনে করে এবং তাদের হত্যা, বিনাশ বা বিলুপ্তি কোনভাবেই সমর্থন করে না। জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় আধুনিক মানুষ বদ্ধপরিকর।

* সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা, মাটি, আলো-বাতাস-পানি--সবকিছু নিয়েই গড়ে ওঠে পরিবেশ এবং মানুষ এই পরিবেশেরই এক অন্যতম উপাদান। পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এর যেকোন একটি উপাদানের ক্ষতিসাধন সমগ্র প্রতিবেশবলয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে। ফলে উপাদানগুলোর পারস্পরিক নির্ভরতাই স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মূল কথা। মানুষ সঙ্গত কারণেই পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভশীল। নানা প্রকার আর্থিক, জৈবিক, চাষাবাদগত, গার্হস্থ্য ও ব্যবহারিক কারণে পশুপাখি ও জীবজন্তুর ওপর রয়েছে তার অতিরিক্ত নির্ভরতা। খাদ্যের যোগান, যোগাযোগ, যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন, প্রাণীর উপজাত দ্রব্যের (by-product) নানাবিধ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে মানবেতর প্রাণীর ওপর মানুষের আস্থা ও নির্ভরতা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। যানবাহনরূপে ও পণ্য পরিবহনে ঘোড়া, হাতি, উট, খচ্চর, গাধা প্রভৃতি এক সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। মরুভূমিতে আজও মালপত্র ও গাড়ীটানার কাজে উট ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যার জন্য উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'। গৃহপালিত উটের মাংস ও দুধ খাওয়া হয়। কৃষিকাজে গরু-মহিষের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। হাতি, ঘোড়া, হালের বলদের সংখ্যা এক সময় ব্যক্তির বিত্ত ও প্রতিপত্তির প্রতীক ছিল। হাতি-ঘোড়ার ব্যবহার ধনাঢ্য মানুষের রুচি ও নান্দনিকতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বার্তাবাহক হিসেবে কবুতরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। The Arabian invented pigeon post in 630 AD as a form of communication. During the Franco-Prussian War pigeons were used to carry mail between besieged Paris and the French unoccupied territory. The Mughals also have used them as their messengers. The Romans used pigeon messengers to aid their military over 2000 years ago. .....By the 12th century, messenger pigeons were used in Baghdad. In the 6th century BC Cyrus, king of Persia used carrier pigeons to communicate with various parts of his empire **(https://en.m.wikipedia.org)**. টিপু সুলতানের সময়েও বার্তাবাহকরূপে কবুতরের ব্যবহার ছিল। কৃষিতে বা যাতায়াত-যোগাযোগে ব্যবহৃত পশুপ্রাণী ছাড়াও কুকুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদি এখনও অনেক আদরণীয় পোষা প্রাণী। আমাদের দেশে সীমিত পরিমাণে হলেও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মমত্বসহকারে প্রতিপালন করা হয়। তাদের জন্য উন্নত খাবার, চিকিৎসা, বিনোদন, বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। এমনকি পোষা প্রাণীর নামে সম্পত্তি উইল করে দেয়ার মতো ঘটনাও সেখানে ঘটে **(www.sylhettoday24.com)**। অনেক নিঃসঙ্গ মানুষ তাদের একাকীত্ব দূর করার উপায় হিসেবেও একান্ত আপনজনের মতো তাদের যত্ন-আত্তি করে থাকেন। নানা কারণেই কুকুর গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বস্ত পাহারাদার হিসেবে অনেক পরিবারেই কুকুর প্রতিপালন করা হয়। বিভিন্ন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী অপরাধী সনাক্তকরণ ও অপরাধ দমনে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করে থাকে। আর্কটিকের বরফঘেরা অঞ্চলে কুকুর-টানা স্লেজ গাড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ধর্মভিত্তিক সমাজে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে মানবেতর জীবজন্তুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'বকরী ঈদ' তথা ঈদুল আজহায় প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকেই 'হালাল' পশু তথা গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা, উট প্রভৃতি কোরবানী দিতে হয়। সন্তানের 'আকীকা' অনুষ্ঠানেও মুসলমানরা পশু জবাই করে থাকে। বিভিন্ন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার 'ওছিলা' বা সহায়স্বরূপ মুসলমানরা 'ছদকা' হিসেবে পশুপ্রাণী দান করে থাকে। অনেকেই বিভিন্ন পীর-দরবেশের মাজারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নানা পশুপ্রাণী 'মানত' করে থাকে। রোগমুক্তি ঘটলে বা কোন দূর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলে মুসলমানরা 'জানের বদলে জান দেয়ার' ঐকান্তিক বিশ্বাসে গরু-ছাগল বা হাঁস-মুরগী দান করে থাকে। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষঙ্গেও জীবজন্তুর ভূমিকা অপরিহার্য। কালীপূজা, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতিতে হিন্দুরা সংশ্লিষ্ট দেবীর কৃপা ও অনুকম্পা লাভের আশায় পশুবলি দিয়ে থাকে। এছাড়াও, অন্যান্য অনেক ধর্ম-বিশ্বাসে ও নানা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও ধর্মচর্চায় মানবেতর প্রাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো মানবেতর প্রাণিকুল নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জীবন ও পরিবেশ রক্ষায় কল্যাণকর ভূমিকা রেখে চলেছে। কেবল গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, হাতি-ঘোড়া বা কুকুর-বিড়ালই নয়, যেসব প্রাণীকে আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ

বলে মনে করি সেসব প্রজাপতি, কেঁচো, ব্যাঙ, শুঁয়োপোকা, বোলতা, মৌমাছি, কাক, মাকড়শা, গুইসাপ এমনকি চড়ুইপাখি পর্যন্ত আমাদের পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাদের দৈনন্দিন কাজের ধরন এবং কর্মতৎপরতা আমাদের জীবনকে গতিশীল, প্রাণময় ও নিরাপদ করেছে। প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে শুধু মধুই খায়না, পরাগরেণু স্থানান্তরিত করে ফুলের পরাগায়নও ঘটায়। জল বা স্থল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঙের অবাধ বিচরণ পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাঙ ফসলের পোকামাকড় খেয়ে ফসলের সুরক্ষা দেয়। কেঁচোকে 'প্রকৃতির লাঙ্গল' বলা হয়। কেঁচো মাটি খুঁড়ে মলত্যাগের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ বের করে পরিবেশবান্ধব 'কেঁচোকম্পোস্ট' তৈরি করে। এই কম্পোস্ট ব্যবহার করে প্রচুর ফসল ও শস্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাকৃতিক বলে এই কম্পোস্ট পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতিতে ছিটিয়ে থাকা অপচনশীল প্লাস্টিক বা পলিথিন পরিবেশের এক বিরাট সমস্যা। একটি বিশেষ প্রজাতির শুঁয়োপোকা পলিথিন পরিপাক করতে সক্ষম। ফসলের ক্ষেত থেকে ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে চড়ুইপাখি আমাদের ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পরিবেশ ও অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। পঁচা-গলা দ্রব্য ভক্ষণের মাধ্যমে কাক আমাদের চারপাশের পরিবেশ সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখছে। শকুন মরা-পঁচা বিশেষ করে গরু-ছাগল প্রভৃতির মৃতদেহ খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখছে। কৃষিজ পতঙ্গ নিবারণের জন্য বোলতার সাহায্য নেয়া হচ্ছে। উপকারী ও মূল্যবান মধুর যোগান দেয়া ছাড়াও মৌমাছি ফুলের পরাগায়নের মাধ্যমে কৃষিজ, ফলদ ও বনজ গাছপালার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর সাহচর্য ও সম-বিচরণের কারণে মানুষের সাহিত্যেও মানবেতর প্রাণী অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সাহিত্য মানবজীবনেরই প্রতিরূপ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যকার সম্পর্কের নিবিড়তার কারণেই মানুষের সাহিত্যে মানবেতর জীবজন্তুও স্থান করে নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তাই মানুষের নাশাপাশি মানবেতর প্রাণীও অল্প-বিস্তর সাহিত্যের অংশ বা বিষয়বস্তু হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পেও মানবেতর প্রাণী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির প্রতিপালন ও পরিচর্যা পারিবারিকভাবেই হয়ে থাকে এবং এরা পরিবারের সদস্যদের মতোই মনোযোগ ও যত্নআত্তি পেয়ে থাকে। গ্রামে এখনও অতিথি এলে বিশেষ করে মেয়ে-জামাই বা জামাই-বাড়ীর কোন আত্মীয়-কুটুম এলে ঘরে-পোষা বড় রাতা-মোরগটি জবাই করে তাদের আপ্যায়ণ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে নানা পর্বের সাহিত্যেই মানবেতর জীবজন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত (**Chatterjee 120-123**) চর্যাপদগুলোতেও গরু, হাতি, হরিণ, সিংহ, উট, শৃগাল, শশক প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করিঃ

১. অপণা মাংসে হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়ই ভুসূকু অহেরী।
তিণ ন ছুবই হরিণা পিবইন পাণী
হরিণা হরিণির মিলঅণ জাণী ।। (ভুসূকুপাদানাম)

২. এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িও। (কাহ্নাপাদানাম)

৩. জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিস তান্তি ধনি সঅল বিআপিউ।। (বীণাপাদানাম)

৪. বেঙ্গস সাপ চঢ়িল জাই।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই।।

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে
পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে।। (ঢেন্‌ঢণ পাদানাম) প্রভৃতি।

মধ্যযুগেও, অর্থাৎ ১৬২২ খৃঃ থেকে ১৬৮৪ খৃঃ সময়কালে রচিত **(আবদুল ২-৩)** কবি দৌলতকাজী ও আলাওলের 'সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী' কাহিনী-কাব্যেও নানাধরনের পশুপাখির উল্লেখ আছে; যেমন:-

লোর সিঙ্গ অন্যজন বোলহ শৃগাল
শার্দুল ছাতন ধিক রসবতী লাল।
যে বুলিলা সর্বজীব বিষ্ণুর শরীর।
শৃগাল কুকুর নাই তাহার বাহির। (মালিনীর বিনয় অংশ)
কিংবা,
উপস্থিত মৃগ দেখি মারিলেক বাণ।
মৃত মৃগ পাইল আসিয়া সেই স্থান।। (আনন্দব্রহ্মার সঙ্কট)
--ইত্যাদি।

মানুষের প্রাণী-নির্ভরতা সমাজে প্রাণীভিত্তিক নানা পেশারও জন্ম দিয়েছে; যেমন- রাখাল, গোয়ালা, কসাই, সাম, মাহুত, মৌয়াল, চিড়িমার, মইশাল, কুলু, গাড়োয়ান প্রভৃতি। নিকট অতীতে টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য গণনা, বানরনাচ, সাপের খেলা ইত্যাদিরও বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। এক সময় হাতি-ঘোড়া যানবাহনরূপে ব্যবহৃত হতো, ব্যবহৃত হতো ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসের শেষাংশে দেবদাসের হাতীপোতা যাত্রায় গরুর গাড়ী ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ধীরগতির এই বাহনে চড়ার ফলে মুমূর্ষু দেবদাস শেষবারের মতো আর পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে পারলো না। মইশাল, গাড়োয়ান/ গাড়িয়াল, রাখাল, মাহুত প্রভৃতিকে নিয়ে বাংলায় অনেক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। "ওকি গাড়িয়াল ভাই, আর কত রব মুই পন্থের দিকে চাই" কিংবা "ওকি গাড়িয়াল মুই চলুং রাজপন্থে" বা "প্রাণ-সখিরে, ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে"--ইত্যাদি তার উদাহরণ। 'মালকাবানু ও মনুমিয়া' উপাখ্যানে কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রেমিকা তার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে তৈরি করা রুমালের এক কোণে রঙ্গিন সুতা দিয়ে লিখে দিতো--"যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে"। এখানেও 'পাখি' বলতে সংবাদবাহী কবুতরের কথাই হয়তো বোঝানো হয়ে থাকবে। যাহোক, এভাবেই মানুষের প্রাণীনির্ভতার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট নানা পেশা ও পেশাজীবীদের কথা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উঠে এসেছে।

আবার সামাজিক বিকাশের ধারায় কালক্রমে অনেক পেশার যে অবলুপ্তি ঘটেছে সাহিত্যে তারও উল্লেখ রয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে দেখা যায়, জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর বাহন যুথপতি নীল বাহাদুরের প্রয়োজন ও কদর দিনে দিনে কমে আসতে থাকে। জমিদারতনয় ইন্দ্র চৌধুরী নীল বাহাদুরের মালিক হলে তার অপমান-অবহেলার আর অবধি থাকে না। কারণ তাকে তুচ্ছ করে নতুন যুগের নতুন জমিদারের বাহন হয় যন্ত্রচালিত বেবি অস্টিন। কত ছোট, অথচ কত গতিবেগ তার!---

> কিন্তু এক বছরে কী পরিবর্তন! কী বিস্ময়করভাবে নিরর্থক হয়ে গেছে তার সমস্ত কিছু। মৃদু গর্জন করে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা ছুটে যায় পিলখানার সম্মুখ দিয়ে। ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিন। কেমন করে কে জানে, সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। **(গঙ্গোপাধ্যায় ২০৫-২০৬)**

শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা' কাব্যগ্রন্থের 'জনৈক সহিসের ছেলে বলছে' কবিতায় ঘোড়ার প্রচলন ও একসময় তার প্রচলন কমে আসার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়:-

"তাঁকেই ভাবছি যিনি গোড়াকে জরুর মতো ভালবেসেছেন
আজীবন। মুমূর্ষু পিতার চোখে তরুণ ঘোড়ার
কেশরের মতো মেঘ জমে প্রতিক্ষণ।".....

কিংবা,

কখনও মুমূর্ষু পিতা ঘোড়ার উজ্জ্বল পিঠ ভেবে
সস্নেহে বুলোন হাত অতীতের বিস্তৃত শরীরে।
মাঝে মাঝে গভীর রাত্তিরে
দেখেন অদ্ভুত স্বপ্নঃ কে এক কৃষ্ণাঙ্গ ঘোড়া উড়িয়ে কেশর
পেরিয়ে সুদূর
আগুন রঙের মাঠ তাঁকে নিতে আসে (**রাহমান ২৩-২৪**)।

রূপকথা, চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা, নভেলার পর্যায় অতিক্রম করে রবীন্দ্রপূর্বযুগ পর্যন্ত রচিত সমস্ত সাহিত্যেই মানবেতর প্রাণীপ্রসঙ্গের কমবেশী উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সময়ের সাহিত্যে উল্লেখিত মানবেতর প্রাণীর বিষয়গত ও উপস্থাপনগত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। উনিশ শতকের শেষাংশে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে মানবেতর প্রাণীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়ভাবনায় গল্পে উপস্থাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্প চরম সার্থকতা লাভ করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি মানবেতর প্রাণীভিত্তিক গল্প লিখেছেন মাত্র একটি। নাম 'সুভা'। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বাংলা ছোটগল্পের এই ক্ষেত্রটি ব্যাপক সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারতো, সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতায়ও এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তাঁর 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার বিদায়', 'বৈরাগ্য', 'কর্ম,' 'দিদি', 'পরিচয়', 'পুটু', 'দুই বন্ধু', 'সঙ্গী', 'স্নেহদৃশ্য', 'করণা' প্রভৃতি কবিতায় নিটোল কাহিনীচিত্র ও ঘটনার উল্লেখ আছে। যে ভৃত্য সকাল বেলায় দেরিতে কাজে এসে প্রভুর ক্রুদ্ধ বচনের উত্তরে শুধু বলল--

"কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে":
যে মেয়েটি---
"জননীর প্রতিনিধি কর্মভারে অবনত অতি ছোটদিদি"।

সারাদিন নদীতীরে বাসন মাজে আর তারি যে-ছোট ভাই, নেড়া মাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নেই, পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে দিদির আদেশের অপেক্ষায় স্থিরধৈর্যভরে বসে থাকে; আরেকদিন সেই যে-ছোট ছেলেটি বাচ্চা ছাগলের চিৎকারে কেঁদে উঠল আর তার দিদি ছুটে এসে বাচ্চা ভাইকে এক কোলে আর বাচ্চা ছাগলকে অন্য কোলে নিয়ে সোহগ করল; যে গ্রাম্য যুবক একদা প্রিয় মহিষকে ডাকল "পুটুরাণী আয়", যে-মানুষ ও যে-পশু তাকাল একে অপরের পানে মুগ্ধমূঢ় স্নিগ্ধ চোখে আর স্নেহের কৌতুকে; বেদের যে মেয়েটি খেলা করছিল পালিত কুকুরের সঙ্গে, তাদের স্নেহকৌতুক করুণাময় জীবনের সঙ্গে কবি একাত্ম হয়েছেন কাব্যসৃষ্টির মুহূর্তে, সিনেমার ফিতের মতন এদের ক্ষণিক জীবনদৃশ্যগুলি পর পর চলে যায় আমাদের চোখের সামনে। এ-সমস্ত ঘটনাংশ নিয়ে ইচ্ছে হ'লে কবি হয়তো বিস্তৃত কাহিনী রচনা করতে পারতেন। **(ভট্টাচার্য ১১৫)**

যাহোক, রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ের প্রায় পাঁচ-ছয় দশকে মানবেতর প্রাণীকেন্দ্রিক বেশ কিছু আখ্যান-নির্ভর ও রসনিটোল ছোটগল্প বাংলা গদ্যসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এসব গল্পের বিষয়বস্তু নির্মাণে মানুষের পাশাপাশি মানবেতর প্রাণীকে সমান গুরুত্বে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে মানব-চরিত্রেরও অধিক তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব প্রাণীচরিত্র বাদ দিলে এমনকি কোন কোন গল্পের গল্পত্বই থাকে না। এ-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়র 'আদরিনী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', ইব্রাহিম খাঁ'র 'পুটু', 'মনি সাপুড়ে', আবুল মনসুর আহমদ'র 'গো-দেওতা কা দেশ', মাহবুবউল আলম'র 'কোরবানী, 'যমপাখী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও

নাগিনী', 'কালাপাহাড়', 'কামধেনু', নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালঘোড়া', কাজী নজরুল ইসলামের 'পদ্ম-গোখরো', 'বনের পাপিয়া', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোম্প', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'বাঘিনী' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

ষাটের দশকে এসে নতুন রীতিবৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে বাংলা ছোটগল্প বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী লেখকদের মতো এসময়ের গল্পকারদের রচনায় মানবেতর প্রাণীকেন্দ্রিক আখ্যান-প্রধান গল্প বড় একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। সত্তরের দশক জুড়ে রাজনীতির উত্তাল-তরঙ্গে দেশ থাকে মুখরিত। ফলে সাহিত্যের ফলন এসময়ে তেমন কিছুই ফলেনি। আশি ও নব্বইয়ের দশক বাংলাদেশের ছোটগল্পের আঙ্গিক নিরীক্ষার দুর্বিনীত কাল। এ সময়ের গল্পের ফর্মে চলে নতুন ভাঙ্গাগড়া ও নতুন বিন্যাস-বিনির্মিতি। প্রগাঢ়, ঋজু, অন্তর্ভেদী ও কাব্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষিক পরিস্থিতির কারণে গল্পে তৈরি হয় এক ধরনের ধ্রুপদী আবহ। ছোটগাল্পিক চেতনা হয়ে ওঠে অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন ও জীবনসন্ধানী। এ-সময়ের গল্পকারদের গভীর জীবনতৃষ্ণা, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরীক্ষা-প্রবণতা আশির দশক ও পরবর্তী সময়ের ছোটগল্পের সঞ্চালক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে, এ-সময়েও মানবেতর প্রাণীকে উপজীব্য করে আখ্যানপ্রধান বা মানুষ ও প্রাণীর নিবিড় সম্পর্ক-নির্দেশক উল্লেখযোগ্য কোন ছোটগল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। মানবেতর প্রাণীর প্রসঙ্গ গল্পে থাকে, তবে তা সংকেতিত বা প্রতীকায়িত; সরল বা সমকৌণিক কাহিনী-প্রকাশক নয়।

কাজেই দেখা যায়, সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতায় মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অপরিবর্তনীয় থাকলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের বিষয়বস্তুগত গ্রন্থনা নানা সময়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগগত কৌশলে উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজ ও সামাজিক মানুষের বস্তুগত বিকাশ বা উন্নয়ন, মানুষের মনোজাগতিক জটিলতা ও সূক্ষ্ম জীবনবোধ, নিরীক্ষাপ্রবণতা, অদ্ভুত-নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনচর্চায় আধুনকতার ছোঁয়া প্রভৃতি কারণেই সাহিত্যে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর উপস্থাপনাগত ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি ও প্রাণী-নির্ভরতার কারণে এবং মানবজীবনে প্রতিবেশের অনিবার্য প্রভাবের কারণে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাংকেতিক কিংবা প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে মানুষের সাহিত্যে মানবেতর প্রাণীও উল্লেখ্যযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে একথা বলতেই হয় যে, মানবেতর প্রাণিকুল মানব-পরিবেশের এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য অংশ। দৈহিক শক্তি, হিংস্রতা, উন্মত্ততা বা 'নীচতার' বৈশিষ্ট্য নিয়েও মানবেতর প্রাণীরা আজ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী নয়, বরং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে মানবজীবনে সমৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়নে তারা মানুষের পরম বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। উন্নত সভ্যতা ও শুদ্ধ চিন্তার মানুষ তাই আজ মানবেতর প্রাণিকুল রক্ষায় বদ্ধপরিকর। মানুষের জীবনচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ মানবেতর প্রাণীকুলও গুরুত্বের সাথে আদৃত ও চর্চিত হয়। সভ্যতার যতো বিকাশ ঘটবে, মানবেতর প্রাণীদের জন্য মানুষের হৃদ্যতা ও সহমর্মিতাও ততই বাড়তে থাকবে।

## তথ্যসূত্র


আবদুল, মোহাম্মদ কাইউম। (সম্পাদিত), *আলাওল বিরচিত সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প*, সম্পদনা: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৩৬১।

ঘোষ, মিতালী। *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, ভলিউম ১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি- জুন, ২০২১।

নেহেরু, জওহরলাল। *পৃথিবীর ইতিহাস*, অনুবাদঃ প্রবোধচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০০০।

ভট্টাচার্য, দেবীপদ। (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথ, অমলেন্দু বসু: 'হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট* ইস্টলাইট বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৩৬৮।

রাহমান ,শামসুর। *বিধ্বস্ত নীলিমা*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৭৩।

Chatterjee S.K.: *Origin and Development of Bengali Language,* vol. 1, Calcutta University Press, Calcutta, 1926.

https://en.m.wikipedia.org (carrier pigeon history).

www.sylhettoday24.com (পোষ্য কুকুরের নামে কোটি টাকার সম্পত্তি দান)।